বাংলা নাটক ❑ মালিনী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পর্যায় ঃ ১ একক ঃ ৩

৩.১ ❑ রবীন্দ্রনাথ ও 'মালিনী'

৩.২ ❑ 'মালিনী' ঃ নাটকের উৎস

৩.৩ ❑ 'মালিনী' ঃ কথাবস্তু

৩.৪ ❑ চরিত্রবিচার ঃ মালিনী

৩.৫ ❑ নায়কবিচার ঃ সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর

৩.৬ ❑ অপ্রধান চরিত্র ঃ মহিষী, কাশীরাজ

৩.৭ ❑ নামকরণ ঃ 'মালিনী'

৩.৮ ❑ কাব্যনাট্য হিসেবে 'মালিনী'

৩.৯ ❑ ঐতিহাসিক ও 'মালিনী'

৩.১০ ❑ ট্র্যাজেডিবিচার ঃ 'মালিনী'

৩.১১ ❑ সংলাপ বিচার ঃ 'মালিনী'

৩.১২ ❑ দ্বন্দ্ব ঃ 'মালিনী'

৩.১৩ ❑ নাট্যসমালোচনা ঃ 'মালিনী'

৩.১ ❑ রবীন্দ্রনাটক ও 'মালিনী'

রবীন্দ্রনাথের মোট নাটকের সংখ্যা ৪৯। বিভিন্ন শাখাভুক্ত ও রূপভেদে ব্যক্তি, গীতিনাট্য, নাটিকা, নাট্যকাব্য, কাব্যনাট্য, প্রহসন, নৃত্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঋতুনাট্য, সামাজিক নাটক, নৃত্যনাট্যের শ্রেণি ধরেই সংখ্যাটি এমন। প্রথম ও শেষ প্রকাশিত নাটক যথাক্রমে 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ও 'শ্যামা' (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতে সমানভাবে বিচরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর কাব্যসাহিত্যের পর, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সৃজনশীলতার সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর নাট্যরচনায়। তাঁর নাটকগুলির বিষয় বস্তুতে অভিনবত্ব, সূক্ষ্মতা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, বহুলতা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বাংলার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন সমকালীন জীবনের প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ থাকেনি। সাহিত্যজীবনের শুরুতে তিনি পুষ্পিত রেখে গীতিনাট্য। সেই সময়ে গীতিনাট্যের আঙ্গিকে হয়ে 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'মায়ার খেলা' রচনা করেছেন। এরপর শেক্সপীয়রের রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে 'রাজা

ও রাণী', 'বিসর্জন'-এর মতো নাটক লেখা। 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এর মতো কাব্যনাট্যে প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে ব্যবহারিক ধর্মের সংঘাতচিত্র। 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর'-এর মতো তত্ত্বনাট্যে কোনো এক সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রেক্ষাপটে, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া। 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা'-র মতো প্রহসনে নিপুণ বিদ্রুপ ও কৌতুকরসময়তার আস্বাদ। 'শেষরক্ষা', 'তপতী', 'বাঁশরী'-এর মতো নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেন আধুনিক প্রতিনিধি। আবার 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ'-এর মতো নৃত্যনাট্যে অনবদ্য শিল্পবোধের নৃত্যকলাটি সার্থক। গীতিনাট্যশৈলী, উপন্যাসনাট্যশৈলী, বিষয়বস্তু বিবিধ রূপান্তরেও—সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলোর বিশেষত্ব পরিচিতকে ছাড়িয়ে গেছে। আধুনিক যুগে থেকে নিখুঁত জীবন, ইতিহাস থেকে সমকালীনতা সবকিছুই এক সাথে ছুঁয়েছে রবীন্দ্রনাটক। 'মালিনী'ও (১৮৯৬) তার অন্তর্ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ খুব অনায়াসেই কোনো এক দূর অতীতের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক আধারে জীবনের স্বরূপ অন্বেষণ থেকে সমকালীনতার ছোঁয়ায় তার মুক্তির হদিস পেয়েছে। 'মালিনী'-তেও তেমনই ইঙ্গিত। 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকের সঙ্গে, 'সোনার তরী' (১৮৯৪) কবিতার সঙ্গে, 'অতিথি' (১৮৯২) গল্পের সঙ্গে কোথায় তার সাদৃশ্য। ধর্ম-প্রেম-বন্ধুত্বের দ্বন্দ্বসংঘাতকে পেরিয়ে পৃথিবীর মুক্তমুক্তি করে বিশ্বপৃথিবীর সত্তায় যা দিয়ে যেন আত্মকর্মের জীবনবোধটিকেই মহত্ত্বদান।

৫.২ ❑ 'মালিনী' ঃ নাটকের উৎস

'মালিনী' নাটকের দুটি সম্ভাব্য উৎস আছে। একটি, রবীন্দ্রনাথের লন্ডনে বাস করার সময়ে ঘুমের মধ্যে দেখা একটি স্বপ্ন। অন্যটি হল বৌদ্ধসাহিত্যে মহাবস্তু অবদানের একটি কাহিনি। এই নাটিকাখানার লেখা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পেয়েছিলেন তা জানা যায় তাঁর ভাষাতেই—

"মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।...তখন ছিলুম লন্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল ডিভনশায়ার ছিলেন আমার নাইটদের বাসায়। প্রবাসী ভারতীয়দের যাঁরাই বেড়াতে এসে ছিলেন, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। সেখানেই রাত হয়ে গেল। ...পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে তাঁর কন্যাকেই বাড়ি-ঘরদ স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুতুম তখনো চলছে কলরবের অস্থির পর্ব, আমার ঘুম ছিল অস্থির হয়ে। এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এসেছে রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।...অনেকদিন এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।"

মহাবস্তু-অবদানের কাহিনীটি হল এই রকমের : মালিনী বারাণসীর রাজকন্যা। কিন্তু কাশ্যপ তাঁর পরম আশ্রয় পান। বৌদ্ধ ধর্ম কাশ্যপের সম্পর্কে রাজ্যের ব্রাহ্মণকুলের আঘাত পরম উঠেছিল। পিতৃভক্তির কাশ্যপকে রাজপুত্র আক্রমণ করতে কিন্তু হয়ে ব্রাহ্মণের দল রাজাকে বাধ্য করেন মালিনীকে নির্বাসিত করতে। মালিনী ঐ সময় থেকে নিয়েছে এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করেন পিতার কাছে। ইতিমধ্যে রাজপরিবার ও আত্মীয়কুল মালিনীর পাশে এসে দাঁড়ান। বারো রাজপুত্র এবং অমাত্যরা অচিরেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। প্রধান নাগরিকেরাও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন একদিকে, অন্যদিকে কাশ্যপকে হত্যা করার উদ্যোগ নেন। পরিশেষে, তাঁদের সেই অপপ্রয়াস ব্যর্থ হলে, সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় রাজ্যে। ব্রাহ্মণেরাও কিন্তু হটে যান।...রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের আভাসটি আহরণ করেন। স্পষ্টতই নাটকের প্রথমাংশ মহাবস্তু-অবদান এবং দ্বিতীয়াংশ কল্পকাহিনী থেকে সংকলিত হয়েছে।

৩.৩ ❑ 'মালিনী' ঃ কথাবস্তু

কাশীরাজের রাজকন্যা মালিনী নবধর্মের আদর্শে দীক্ষিত। কাশ্যপের কাছে তিনি মানবধর্মের শিক্ষা নিয়েছিলেন। রাজা দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত। রাজ্যের সনাতন হিন্দুধর্ম বিপন্ন—এমন আশঙ্কায় ব্রাহ্মণেরা বিদ্রোহী হয়েছেন। তাঁরা রাজকন্যাকে নির্বাসনে পাঠাবার আবেদন নিয়েছেন। একদিকে পিতৃস্নেহ অন্যদিকে রাজনীতিক্ষেত্র—দুয়ের মধ্যে রাজা দোলায়মান। দোলাচল বিদ্ধ রাজহৃদয়। মাতৃহৃদয়ের কথা মালিনীর আসন্ন আশঙ্কায় কম্পিত হয়ে যায় বারে। আবার রাজাকে শাসন করেন মালিনীকে নির্বাসন দেবার কথা শুনে। তার একাধিক একদিন সমরের সন্ন্যাসী হয়ে উঠেন। মালিনীকে মহিষী আঘাত দিতে চান ক্ষেমঙ্করীকে আর মালিনী নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় 'বহুজন হিতায় চ, বহুজন সুখায় চ'। কিন্তু সেই বহুজন তো সনাতন হিন্দু ধর্মের বাইরে গিয়ে নূতন মানবধর্মের কথা ভাবতে পারেনা। তারা তাই মালিনীর নির্বাসনকামী।

এভাবেই ব্রাহ্মণবেশী বিদ্রোহের মাঝখানে একদিন এসে দাঁড়ান মালিনী। ক্ষেমঙ্কর, সোমাচার্য, চারু দত্ত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা মালিনীর উপস্থিতিতে প্রথমে হতবাক হয়ে যান ঃ

"এ কী দেবী, এ কী দেখা। মহামহী এ যে
এসেছেন প্রাসাদের গবাক্ষ ছেড়ে।
এ কী অপরূপ রূপ। এ কী জ্যোতির্ময়ী
দেবমূর্তি। এ তো নহে সাধারণ নারী।
কোথা হতে এলে মাতঃ কী করিতে আজ,
কী করিতে কাজ।..."

এভাবেই মালিনী লোকমাতার ভূমিকায়। ব্রাহ্মণরা দেখে গেল মালিনীকে, মালিনীর দেবমহিমা। মাতৃমূর্তি দেখলেন। তিনি বিদ্রোহের দেবতা হয়ে রাজপুর কাছের বাণী থেকে চলে গিয়েছিলেন। দেখে গিয়েছিলেন

প্রিয়বন্ধু সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয় মালিনীকে প্রথম দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল। মালিনীর মানবধর্ম সম্পর্কে সুপ্রিয়র বোধ মিটেছিল। অন্যদিকে ক্ষেমংকর চিঠিতে সুপ্রিয়কে জানিয়েছিল, সে বহুদূরবর্তী নগরী থেকে সৈন্যদলের সাথে কাশীতে ফিরবে রাজকুমারী মালিনীর প্রাণদণ্ড দিতে। সুপ্রিয় তার প্রিয় মানবীর জন্য বিসর্জন দেয় আজীবনের বন্ধুত্ব। ক্ষেমংকরের চক্রান্তের কথা সে জানিয়ে দেয় রাজাকে। রাজা গুপ্তচর দ্বারা গোপনে সৈন্যদল দিয়ে ক্ষেমংকরকে আক্রমণ করে। আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত ও বন্দী হয় ক্ষেমংকর। রাজা সুপ্রিয়কে পুরস্কার দিতে চান এবং তাকে 'অসম্ভব আশা' পূর্ণ করার আশ্বাস দেন। সুপ্রিয় আঘাত করেছে ক্ষেমংকরের বিশ্বাসে। সে অমর্যাদা করেছে বন্ধুত্বের। অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে সুপ্রিয়। বন্ধুর মৃত্যুদণ্ড রদ করার অনুরোধ জানায় সে রাজাকে। রাজার কিছুই অদেয় ছিলনা সুপ্রিয়কে। রাজা ক্ষেমংকরের প্রাণভিক্ষা দিতে স্বীকৃত হন। সেইসঙ্গে মালিনীকেও সমর্পণ করতে চান সুপ্রিয়র হাতে। তাহার শুধু ক্ষেমংকরের কাছে অন্য এক পরীক্ষা দেওয়ার সাধ ছিল। ক্ষেমংকরের বিচারের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাকে উপস্থিত করা হয় মালিনী, সুপ্রিয়, রাজা সকলের উপস্থিতিতে। ক্ষেমংকর কিছু কথা প্রার্থনা করেনা রাজার কাছে। সে ক্ষমা করে না সুপ্রিয়কেও। বন্দী ক্ষেমংকর শৃঙ্খল দিয়েই আঘাত করে সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয়র মৃত্যু হয়। মালিনী চোখের সামনে দেখে তার প্রণয়ীর মৃত্যু। ক্রুদ্ধ রাজা ক্ষেমংকরকে চরম শাস্তি দিতে চান। তিনি খড়্গ আনার নির্দেশ দেন। নাটকের শেষ মালিনীর মূর্ছা যাওয়ায়। মূর্ছিত হবার আগে তার শেষ মিনতি—"মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে।"

৩.৪ ❑ চরিত্রবিচার ঃ মালিনী

মালিনী—কথাটির অনেক অর্থ আছে। ফুলের বাগান যে করে, সেতো সৌন্দর্যের কারবারী। মালিনী তার সুন্দর মন দিয়ে সর্বজনের মধ্যে সুন্দরের চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছে। মালিনী ফুলবিক্রেতার বটে। সেই অর্থেও সে মনে ফুলের রেণু ছড়িয়ে তোলে। বিভিন্ন মানুষের হৃদয় সে ফুলের মাধ্যমে গ্রথিত করে। সে যে ফুলের মালাকার। আবার, মালিনী অর্থে মন্দাকিনী, স্বর্গগঙ্গা। মানুষের কল্যাণে গঙ্গা প্রবাহিত হয়। মালিনীর সর্বজনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে মানুষের কালোকে স্পর্শ করে তোলবার চেষ্টা করেছে। সে গঙ্গারই মতো পবিত্র। দুটি অর্থেই মালিনীর তাৎপর্য একীভূত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মালিনীর প্রেমধর্মকেই অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নাটকটি রচনা করেছিলেন বোঝা যায়। বালিকা রাজকুমারী থেকে মহৎপ্রাণে তাকে বিকশিত করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই মালিনী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নেওয়া যাক—

সরলহৃদয়িনী, উচ্চ কুলসম্পন্না কাশীরাজ কাশীর রাজকন্যা মালিনী। পিতা-মাতার স্নেহ সেবাদির মধ্যে তার রাজৈশ্বর্য, বিলাস আরাম—কিছুর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়না মালিনী। তার কানে বাজে মানুষের আকুল আহ্বান। কাশ্যপের কাছে তাই সে মুক্তির মন্ত্র শুনতে চায়।

"…বাণীসম
কী যেন বাজিছে আসি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতের ভাষায় আমি ভাষিতে আমারে।"

—সেই ডাক শুনে মালিনী রাজকন্যাঃপুর ছেড়ে বাহিরে যেতে চায়। রাজকীয় অলংকার, বেশবাস তার কাছে মূল্যহীন। মহিষী কন্যার এই বিসদৃশ আচরণে ব্যথিত হন। মালিনী মহিষীকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার মাতামহের কথা। মহিষীর পিতা, মালিনীর মাতামহ আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছিলেন সব সম্পদ। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মালিনী বলে—

"…সেই বীর বনবাসী
মোর আত্মমাঝে রেখে দিয়েছ, মা, আমি—
আর কিছু নহে। থাক্-না মা, সর্বক্ষণ
তব পিতৃভবনের বাহিরের ধন
তোমারি কন্যার মুখে…"

মালিনী অকুতোভয়। রাজার তার নির্বাসন চাইলে মহারাজ এবং রাজমহিষী কাতর হয়ে পড়ে। আর মালিনী অনায়াসে বৈরাগ্যের সঙ্গে বলে :

"রাজ্যের পূর্ণ প্রার্থনা। মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে। দাও মোরে নির্বাসন
পিতা।

এই নিজেরে আর্ত-পীড়িত মানব-মানবীর ডাক শুনতে পায় মালিনী। রাজপুত্রের সুখ-বিলাসের মায়া ত্যাগ করে সে মানব-সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হতে চায় রাজকন্যাঃপুর ছেড়ে।

"…বক্ষ ফেটে যায় মহারাজ,
বলো, ছেড়ে সে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা—সে যেন অন্তর্যামী
অধিবাসী মহাপ্রাণী, সেই শুধু আমি।"

—মালিনী রাজা-রাজমহিষীর স্নেহবন্ধনের ঔদাসীন্যকে উপেক্ষা করে না কিন্তু ব্যক্তি মানুষের একক পরিচয়ে সে মানুষের মাঝখানে দাঁড়াতে চায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর একক অবস্থানকে যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই তার, সেখানে মালিনী কিন্তু একক পরিচয়েই মানুষের মাঝে দাঁড়াতে চেয়েছে। পুরোহিত তন্ত্রের কুক্ষিগত ক্ষমতা, রাজতন্ত্রের আধিপত্য সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিকতাকেই আঘাত করেছে মালিনী। মালিনীর বিশ্বাস, তার সহনশীলতা তাকে উত্তীর্ণ করেছে একটা অন্য স্তরে। তাই অনায়াসে মালিনী গিয়ে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ব্রাহ্মণের মাঝখানে। অকপটে ব্যক্ত করে নিজের পরিচয়। সে 'রাজার দুহিতা' এবং সে-ই সেই

নিজেরই নগ্নদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ, যার নির্বাসন সাধন করে গেছেন তাঁরেই বিধাতা। এরপর 'রাজার মূর্তির' মহিলা উপলব্ধি হয় 'শিল্পেরই' মূর্তিরূপ।

মহিলা পুরুষ সোকসাধারণ মূর্তিরূপে অবতীর্ণ নয়। মহিলা অন্তরের প্রাণরসে ভেসে যায় না। মহিলা সহজাতরূপে নিজেকে করেছে নিজের অন্তর্মুখী মূল্যবোধে জীবন্ত।

"রাজকন্যা আমি—কখনো স্বপ্নেও খুলে
হারি নি আমিত্বে, সেদিন যদি এ সংসার
দূরে বিপুল—তোমার যা ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা,..."

পরিবেশ বিভীষিকা মূলেই আক্রমণ মহিলাদের মনোজগতের জন্য বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে।

পরিবেশের অন্তর্মুখী দুঃখ থেকে মহিলাদের মূর্তিরূপ সম্ভব হয়। মূর্তিরূপের মধ্যেই আত্মরক্ষার নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে মহিলারা। রাজকন্যা মহিলারা নয়, সোকসাধারণ মহিলারা নয়। মহিলারা প্রাণী। মূর্তিরূপের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে মহিলারা নতুন করে আবিষ্কার করে নিজেকে :

"...হায় বিধাতার,
যত তুমি মহিমেরে আছি যেন আজ
আপনারে প্রেয়িতেছি পরিচয়ের মতন।
যে দেখার মর্ম তোর বক্ষাতলের তলে
লালায়িত এতদিন বিস্মৃতাই বাণী
সে আজি তোমার দেশ। সেদিন, রাজন,
কেন তুমি আসিলে না?..."

মহিলারা মূর্তিরূপের কাছে খুঁজে পায় একটা অনাস্বাদিত আনন্দ। আজ প্রতিবাদী মনন মহিলারা মূর্তিরূপের মাধ্যমে রাজকন্যার আপনজনের মনন নিয়ে এসেছে, মহিলারা লাভ করেছে রাজকন্যার আপনজন।

"আজ নহে, আজ নহে। সকলের সাথে
চিরদিন আমার;..."

মহিলারা মূর্তিরূপের সম্পর্কে ভেসে ভেসে হারিয়ে যায়।—একটি পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে যেতে যেতেই মহিলাদের সামনে একটা অপরিচিত অন্তরায়ের আবির্ভাব। কোনোকিছু অন্য অনেকটা সমস্যার মতো বিভিন্নতা রাজকন্যাকে। মহিলাদের আবেগের আনন্দ, আর নিবিড় নিজেকে, তাদের বিভিন্নতা করেছে নিজেরই রাজকন্যে। সমস্যাটা জীবনের করে নিয়েছে মহিলাদের। জীবনের করে নিয়েছে মূর্তিরূপ। শুধু জীবনের নয়, তাদের নিজেকে সমর্পণ করে

সুপ্রিয় বন্দী হয়ে গেছে। ক্ষেমংকরের কাছেই শুধু মালিনী পরাজিত। রাজা, রাজমহিষী, সমস্ত প্রজাদের স্নেহ, প্রেমের স্রোত মালিনীকে ঘিরে রয়। এক অবাধ্য উৎসমুখী স্রোত ক্ষেমংকর মালিনীর অন্তরমন মূল খুঁজে কিছুই তাকে বশী করতে পারেনি ব্রাহ্মণধর্মের কঠিন ব্রত থেকে। সুপ্রিয় আজন্ম বন্ধুত্বে জলাঞ্জলি দিয়েছে মালিনীর প্রেমের কাছে। এই অন্তরালে মালিনীর সামনেই ক্ষেমংকর হত্যা করে সুপ্রিয়কে। 'মালিনী' নাটকটি শেষ হয় মালিনীর এই উচ্চারণে ঃ "মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে।"

যে নবধর্মে ত্যাগ, ক্ষমা, সমদর্শিতাকে আদর্শকে পালন করেছিল রাজকন্যা মালিনী, জীবনের চরম সন্ধ্যায় সামনে দাঁড়িয়েও সেই আদর্শ থেকে সে সরে আসে না। অতএব সুপ্রিয়র হত্যাকারীকেও সে ক্ষমা করতে পারে। মালিনীর ধর্ম অতএব পরাজিত নয়। নবধর্মে সে সাধ্বী প্রতিষ্ঠ, একথা প্রমাণ হয়ে যায়। আবার 'মালিনী' নাটকে মালিনীর জয়ই সুনিশ্চিত হয়েছে বলবার। ক্ষেমংকরের কাছে মালিনীর পরাজয় কথা ঠিক, তাঁহা ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে নবধর্মের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের শেষ হতে পারে না। আসলে নাটকটিকে যেখানে সমাপ্ত হয়েছে, সেখান থেকে সামনে তাকালে মালিনীর জয়ী হওয়া আমাদের অনিবার্য বলে মনে হয়। ক্ষেমংকরের প্রাণের মালিনী দেবীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে, এমন একটি সম্ভাবনা থেকেই যায়।

অন্তঃপুরের প্রেমলতার যখন সে রাজৈশ্বর্য ও বিলাসিতা ত্যাগ করে জনসমাজে মিশেছে; তখন সে মানবী থেকে দেবীতে রূপান্তরিতা। আবার নবধর্মবাদীদের অবহেলা ও সমর্থন পেয়ে যখন সে পুনরায় ঘরে ফিরেছে, তখন সে দেবী থেকে মানবীতে রূপান্তরিতা। আবার, সুপ্রিয় যখন মালিনীকে রাজার মাধ্যমে পেতে চলেছে, তখন সে জানিয়েছে ক্ষেমংকরের বিদ্রোহ ক্ষমা করে সে শুধু অর্ধাঙ্গিনী হবেনা। তখন সাধারণ, তুচ্ছ প্রার্থিনীতে রূপান্তরিতা মালিনীর স্থান লক্ষ্মীর রাজ্য। আসলে, সমগ্র নাটকে দেবী ও মানবীর দ্বিতত্ত্বের মধ্যে মালিনী আবর্তিতা। যতো সূক্ষ্ম মালিনী-চরিত্র এ অভিনবত্ব।

৩.৫ ❑ নায়কবিচার ঃ সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর

সুপ্রিয় আর্তিক ব্রাহ্মণ। আনুষ্ঠানিক প্রাচীন ধর্মের প্রতি তার রয়েছে শিথিলতা। নবীন বন্ধুপ্রীতি ও নির্ভরশীলতায় সে দীপ্ত। অন্যদিকে মালিনীর প্রেমে আসক্ত। জীবনের আনন্দময় প্রেমলোকে সে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দীপনে দীপ্তার প্রেমী করে। দয়া ও মায়ার সমস্ত দীর্ণ তার বুকে। তাই রয়েছে চঞ্চলতা ও প্রেমপ্রবণ মানসিকতা। দুর্বল মনকে দীপ্তিতে দেবীর প্রতি অটল ভক্তি তার। একদিকে সত্যের পথে দাঁড়ানো, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক—এ দুইয়ের মধ্যে জটিল এক ট্র্যাজিক চরিত্র সে।

ক্ষেমংকর মনস্বিতার দীপ্ত, জ্ঞান, বিশ্বাস ও মহত্ত্বে অধিষ্ঠিত। তার বীরধর্ম ও বন্ধুত্বের একটি সত্যে বাঁধা। তাই কোনোও কোনো দ্বিধা ও ভীতি নেই। আত্মবিশ্বাসী কাঠিন্যে অনড় এক পুরুষ, দৃঢ় চরিত্র। সুনীতিনিষ্ঠ সনাতনধর্মের পূজারী সে। সনাতনের রক্ষিতে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় কঠিন আত্মবলে, তাই বন্ধুত্বের প্রতিও তার সন্দেহ।

এখন দেখা যাক, নায়ক কে। নায়ক হল সেরা যে হারায় না কোনো। আমার নায়ক হল ঘটির আলাদা না পৃথগাত্মকতা। আমাদের 'দটিলগ্রন্থ' অনুযায়ী নায়ক দীর্ঘোন্নত, সিংহস্কন্ধ, প্রাংশু, বিপুল বক্ষপিঞ্জর বিশাল, মদ উপভোগে পারদর্শী, গভীর, সত্যভাষক ও ঈর্ষণীয় পুরুষ যার মধুর আকর্ষণে সবাই মুগ্ধ।

এখন আমিনিকের অনুযায়ী দেখে নেওয়া যুটির ও কেয়াকলের আলোচনা। কেয়াকলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ণতা এমনটির। সেখানে নিজেরই প্রাকৃতিক রাজকন্যা আমিনীর নির্বাসিত আবর্তন করে। প্রকৃতপক্ষে, সেখানকার, উচ্চমানের ঘিরেনি প্রাকৃতিকদেশীর অবস্থানে আলাদা করে বিভিন্ন কথা যায় যুটি পুরুষকে। প্রাকৃতিকদেশীর নায়ক তারা। সাধারণের আমি বিভক্তিক সেখানে যাকে না। তবুও একজন যুটির কথা বলে। আমিনিকেতনে আমিনিক প্রকৃতিকের ঐতিহ্যিকতা নিয়ে সে প্রশ্ন তোলে :

"আর। মহাশয়,
যুটে উপাদেশ সেরেছ আর কাকে কথা।
আর নিয়েছিল নির্বাচনে?"

—এই প্রশ্ন যুটিয়ের। সাধারণের পরিচয় নয় সে কিন্তু প্রাকৃতিকতার নিজেরই সে আর, সেই আর্যের তোর আর নেই। সেখানেই প্রাকৃতিকতার আমিনিকেই একটি ঘটির যুটিয়ে। পাঠকদের নিয়ে সে আলোচনা করে একক নিজেরই। কেয়াকলের সঙ্গে তার আমিনিকের মুলাম্পর্ক। বন্ধুত্বের কারণেই শুধু কেয়াকলেই মুখরে পারে যুটিয়েকে। যুটিয়ে কিন্তু নিজেরই হয়। নিজেকে প্রাকৃতিকতার আলাদা তার আছে নিজের।

"বন্ধু, কাকাকে নিজের।
যুগলের যুগিনের পরি পরে আর।
যাপাকের ক্রিয়াকর্ম ছাত্র-উপদেশ
এই শুধু আর আর আমিনিকে বিশ্বাস
নিয়েপরেছ।..."

আমাদের—প্রকারীয় নিয়েপরের নিশ্চাল যুটিয়ের আপেক্ষে। আমিনীর আরো আমাদের কথা যুটিয়ে পরে না ঠিকই কিন্তু যুটিয়ে যে আর্যের কথা বলে, ঠিক, সাধীন প্রাকৃতিকতার নিজুলে সেও তো এক আমাদের আর্য। এই আমাদের আর্যের বীতিনিষ্ঠা, আমন-নিষ্ঠেকার জন্য প্রাকৃতিকতা সেরেক সেরিয়ে তোলেও ঘিরে আছে না যুটিয়ে। এখানেও আমিনী ও যুটিয়ের পথ নিজেদিকে এলাপাত হয়ে যায়।

বন্ধুত্বের আছে কিন্তু যুটিয়ে নমনীয়। বন্ধুর আর নামে আমিনীয়। নামাত, বন্ধুত্ব, প্রেম ও সমাজ "যুটিয়ুটি পরে" নির্ণয় করে না একথা যুটিয়ে নিজেকেকারে আমিনিকে নেয়। এই আমিনীয় আমিনিকেতনে সমাজ নিজেরই প্রাকৃতিক ঘিরেনিক হলেও যখন কেয়াকলে নিজেরের আমার নেকে পরে আসে না, যুটিয়ে তখনও বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। পরিণত যুটিয়ে অনে অনে নিজেকিত হয়ে নিজেরিল সমাধানের পুনর্নিশ্চিত আছে। কেয়াকলে যুগিনিক প্রকৃতিকের ধনপ্রাপ্ত আলাদা আমার। একক আমি প্রাকৃতিকতা করে পরিণতকর্ম করার সময় করে। যুটিয়ে কিন্তু বন্ধুত্বের আছেরেন তেকে যায়। আর পথ কেয়াকলের পরেনের সঙ্গেও তোল না।

অথচ ক্ষেমংকরকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারে না সুপ্রিয় তখন সেখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বের যন্ত্রণা, বন্ধুত্বের দাবিই মুখ্য হয়ে ওঠে।

"...দিশাহীন চোখে
দীপ্তহীন পার্শ্বে তব।"

দোলা দোলায় দুলেছে সুপ্রিয়। সুপ্রিয় আসলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শের কাছে অসহায়। ঠিক একইভাবে মালিনীর কাছেও তার শর্তহীন সমর্পণ। ব্রাহ্মণত্ব, শাস্ত্রমত ইত্যাদি ধর্মবোধের প্রতিকূল হলে সুপ্রিয় তর্ক করে। মালিনী যে ধর্মের কথা বলে, সেই ধর্মের কথা বলে, সেই ধর্মের আদর্শে সুপ্রিয় প্রাণিত নয় কিন্তু মালিনীর কাছে তার স্বীকারোক্তি :

"শাস্ত্রমতে তর্ক করি, মতে তোমা-সনে।
সবার পণ্ডিত আমি, তোমার চরণে
বালকের মতো।..."

—এই সুপ্রিয়, বন্ধুত্বের কাছে, ধর্মনীতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে প্রশ্নাতীত ভাবেই। আবার বালকের মতোই অসহায় সমর্পণ মালিনীর কাছে : "দেবী সত্য মোর তাত"

সুপ্রিয় প্রণত। মালিনীর কাছে আত্মনিবেদনে তাই সে প্রার্থীর মতোই বিশ্বাসের নিয়ে দাঁড়ায় তার সামনে

"বন্ধু তাহা যদি
ধরি হাত তোরে।"

সুপ্রিয় আদর্শের আকর্ষণেও মালিনীর সহ-পথিক নয় অথচ সেখানে সুপ্রিয় আর্থিক অনুগ নয়।

বন্ধু সুপ্রিয়র পরাজিত হয়ে যায় প্রেমিক সুপ্রিয়র কাছে। আজন্ম অর্জিত ও লালিত বন্ধুত্বকে সুপ্রিয় বিসর্জন দেয় মালিনীর পায়ে। বিসর্জন দেয় ঠিকই কিন্তু সেখানে তার মন জুড়ে দ্বিধা। গোপনতার মধ্যেই ক্ষেমংকরের বিশ্বাস ভেঙে দেয় সুপ্রিয়। আসলে মালিনীর প্রাণ যেখানে বিপন্ন, সেখানে সুপ্রিয় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। রাজাকে জানিয়ে দেয় বন্ধু ক্ষেমংকরের গোপন অভ্যুত্থানের কথা। কিন্তু সেই জানিয়ে দেওয়াটা সুপ্রিয়র পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে বারে বারে বিক্ষত হয়েছে। রাজার যুদ্ধযাত্রা তথা অভ্যুত্থানে ক্ষেমংকর পরাজিত হলে তাই সুপ্রিয় ছুটে যায় তাহার সন্নিকটেই। সেখান থেকে উঠে জীবনকে উপভোগ করার বাসনাও আর সুপ্রিয়র থাকে না। রাজা সুপ্রিয়র প্রাণের পুরস্কার স্বরূপ কন্যা মালিনীকে তার হাতে তুলে দিতে চাইলেও তাই সুপ্রিয় উল্লসিত হতে পারে না। আসলে একদিকে স্বচ্ছ মানুষের সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি কখনো দু'ভাগ হয়ে গেছে দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। একদিকে আজন্মলালিত বন্ধুত্ব আর অন্যদিকে প্রেম, সমর্পণ। সুপ্রিয়কে নিয়ে তাই একটা অসহায় অপরাধবোধ। কঠিন করে ভালোবাসতে পারে না, কঠিন করে প্রত্যাখ্যান করতেও পারে না। সুপ্রিয় আসলে দুঃখিনী হলেও বন্ধুত্বের আঘাতে সে বড় বেশি অসহায়। তাই মালিনীর সবার্থে ব্রাহ্মণত্বের পরিপন্থী হলেও, রাজার পক্ষে নিলেও,

অনুরাগকে, একথা কিন্তু সুমিত্র নিজে কখনো উপলব্ধি করেনি, কেদারকেও বোঝাতে পারেনি। মহিলাটিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার পরে সুমিত্র বিভিন্ন সময়ে কেদারকেকে কিন্তু সুমিত্র প্রসঙ্গটির কখনো পারেনি। তাকে বিদ্ধ করতে পারেনি।

মহিলার শেষ মুহূর্তে সে মানুষটাকে নিজের মৃত্যুতে ডেকে এনেছে। নিজেকে নিষ্কলঙ্ক হিসেবেই উপস্থাপিত করেছে কেদারনাথের কাছে। অপরাধীদেরকে অতলান্তিক সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে ভেবে এই মৃত্যু যেন সুমিত্রর কাছে শাস্তি নয়, স্বস্তি।

কেদারনাথ বিশ্বাসী মানুষ। বিশ্বাস যেন মহিলাটি এবং কেদারনাথের কথার ঐশিলিটি কিন্তু সেই বিশ্বাসের মূল কথা মানবতা। কেদারনাথ কিন্তু মানবতার লক্ষ্যে পৌঁছে হাজরাবাদ থেকে কিন্তু ফেরি যাবে না। তাই মহিলাটিকে পাচারে রেখে কেদারনাথের লড়াই নতুনভাবে বিস্তৃতির। এবং এখানে তাঁর মানবিক দুর্বলতাকে সে জয় করে নিতে পারে। মহিলাটির উপস্থিতি বিভিন্ন করেছিল সমস্ত বিরোধী ভাবনাকে কিন্তু একথায় অবিসংবাদিত মানুষটিই কেদারনাথ। এই বিশ্বাসের সেতুর আসনে প্রোথিত ছিল অজস্র অনেক পরীক্ষায়। তাই এরা একটি কেদারনাথ তৈরির সাহায্য করতে পেরিয়েছে। কেদারনাথের একথায় দুর্বলতা, একথায় বিশ্বাসের জায়গা তার নতুন সুমিত্র। কেদারনাথের হাতে যাওয়া কিন্তু সুমিত্রর কাছে নয় বিশ্বাস ভেঙে হাতে যাওয়া। কেদারনাথের হাতে যাওয়ার পর সুমিত্রর যে পরিবর্তন সেটি কেদারনাথের জানা ছিল না। এমনকি কেদারনাথের মনের কোণে কোনও সন্দেহের বাষ্পও জমা হয়নি। মহিলাটিকে ঘেরে সমস্ত ভাবনা তথা সুমিত্রর বিলনাকে কেদারনাথ দেখেছে কিন্তু দেখেনি নিজে কোন সন্দেহই কেদারনাথের মনে স্থান পায়নি। তাই কেদারনাথ যখন ফাঁসী আসামি করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে, তখন সেই ভোলন সাহায্য সে নির্দ্বিধায় জড়িয়েছে সুমিত্রকে। সুমিত্রর জীবনে বন্ধুত্বের স্থান তথা কোন সম্পর্কের কাছে ছোট হয়ে গেছে, একথা কেদারনাথের মনেও স্থান পায়নি। কেদারনাথ ভেবে নিয়েছিল বন্ধু সুমিত্রকে একা তথা ছিল সুমিত্র কেদারনাথের পাশেই থাকবে।

একদিকে কেদারনাথ যেখানে ঘিরে এসে, সেখানে সে বিশ্বাস ঘনিয়ে ভেবে নিয়েছিল সেখানে সমস্তটুকু জুড়ে তথা একজন, তথা এক 'মহীয়সী'। কেদারনাথকে সুমিত্র মানসপটের কথা সেখানে ভেবেছে কিন্তু কেদারনাথ অধিকার। একটি কথাও মুখর বিলনাকে ক্ষমাসুন্দর ভোগে দেখতে পারেনি সে। ভেবে নয়, পরিহাস নয়, কঠিন অর্থনন্দই ধরে পড়েছে কেদারনাথের কণ্ঠস্বর :

"নিশ্চি মনে নক্ষত্রের, তুমি ভেবা মনে
কী কারণ—রাজনৃহয়ারে সুখনাদে
কী ধর্ম মনের মতো কারের সূজন
দীর্ঘ অবলাতে।

আসামি সুমিত্রর কথা কেদারনাথের কাছে 'ভালাপরাধী'। কেদারনাথ পরাজিত কিন্তু সে পরাজয়কে এখন একটি জীবনে ভরাতে চায় না। সুমিত্রকে সে অভিমন্যুর বন্ধু ভাবে ভেবেছে। সুমিত্র মহিলাটির সঙ্গে সুসঙ্গত

সত্যের সাহায্যে আর সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে ক্ষেমংকরকে, এই উপলব্ধিকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি এই উদ্ধত ব্রাহ্মণ যুবক। বন্ধুর ক্ষেত্রে অভিমানবোধ তার সুতীব্র। অতএব—

"এসো তবে কাছে এসো, লহো মোর কর,
ছলো মোরে যদি চেনো, চোরে এক পলে,
তোমার সে সর্বস্বতে—..."

—একথা বলে ক্ষেমংকর আহ্বান জানিয়েছে সুপ্রিয়কে। ক্ষেমংকরের বিচারে সুপ্রিয়র মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। তাই

"বন্ধুরে নিয়েছিলে এসে কাছে তবে
সেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহো তবে বন্ধুত্বের কঠিন বিচার—
এই লহো।"

সুপ্রিয়র মাথায় হাতের শৃঙ্খল দিয়ে ক্ষেমংকর আঘাত করেছে।

'মালিনী' নাটক ক্ষেমংকরের শেষ পরিণতি হয়তো মৃত্যুদণ্ড নয় কেননা এই নাটক শেষ হয়েছে মালিনীর ক্ষমার উচ্চারণে। অতএব নিজের বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করায় এবং বন্ধুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করে শান্তিই সত্য করিয়েছে—এমনটিও ভাবা যেতে পারে।

ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে ক্ষমা করেনি। কারণ অন্যায়ই বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু অন্য একটি প্রশ্নও কি উঠে আসে না? মালিনী রাজকন্যা, মালিনী সুন্দরী, মালিনী সুপ্রিয়র কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছে নিজেকে। অতএব সুপ্রিয়র আবেগে দুর্বল পথ—একটি ঈর্ষার বোধও কি ক্ষেমংকরের মনের কোণে জমিয়ে ওঠেনি? মালিনীকে প্রথম দর্শনে ক্ষেমংকরও যে বিচলিত হয়েছিল সেকথা নাটকের শেষ দৃশ্যে ক্ষেমংকর নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে।

"আমি কি দেখি নি তারে?
ভাবিছ কি আমি নহি মুহূর্তের তরে
এসেছে অজানি এই নারীমূর্তি ধরে
কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিতে তোরে
ফাঁসিতে? অন্তরে মুগ্ধ হৃদয়ের
কাছে কি কি কহিলেন?..."

অতএব নিছক বন্ধুত্ব নয়, ক্ষেমংকর-সুপ্রিয়র মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল রাজকন্যা মালিনী। সুপ্রিয় জয় করে নিয়েছিল মালিনীর হৃদয়। অতএব ক্ষেমংকরের 'আত্মমর্যাদা' যা তার 'অন্তরে অন্তরে' 'অন্তরে অন্তরে' উঠেছিল, সেই 'আত্মমর্যাদা'কে শুধু যে কর্তব্যের দাবিতেই বিদ্ধ করে নিয়েছিল ক্ষেমংকর এমনটি নয়।

তার বিচারের বন্ধু সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল বটে। ক্ষেমঙ্করের হাতে রাজার সামনে সুপ্রিয়র হত্যাদৃশ্য দেখার পরও মালিনীর মুখে ক্ষমার উচ্চারণও একেবারেই অবাস্তব নয়। তিন নায়কের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম দ্বিধা আর ভালবাসার টানাপোড়েনের জন্যে তা তৈরী হয়েছিল।

সার্বিকভাবে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কর্তব্যকর্মের কারণে ক্ষেমঙ্করের মধ্যে নাট্যকোচিত গৌরব অন্যদের অতিক্রমণীয়তা, বন্ধুত্বহারায়, নির্ভুল ধর্মবিশ্বাস, পরিণামাবেগবর্জিত দৃঢ়চিত্ত নায়ক। ক্ষেমঙ্কর নাটকের প্রতিস্পর্ধীচরিত্র।

৫.৬ ❑ অপ্রধান চরিত্র : মহিষী, কাশ্যপ

সন্তানধর্মে আসীন মহিষী। নবধর্ম বা সনাতনধর্ম অপেক্ষা মাতৃধর্মে বলীয়ান। অবশ্য মাতৃস্নেহে তিনি। সেখানে তিনি রাজনীতিক হোতেন না। মায়ের মত করেই তার রাজকুমারী বসনে-ভূষণে-অলঙ্কারে সেজে রাজঅন্তঃপুর আলোকিত করে থাকুন। রাজমহিষীর অতীত পরিচয় জানা যায় মালিনীর মুখে। মহিষীর জন্ম 'ক্ষত্রিয়ের কুলে'। কন্যার সুকঠিন ধর্মাচরণ, ক্ষেত্রে রোগিণী চিত্ত বাহিরের পৃথিবীকে দেখার বাসনা মহিষীকে বিচল করে। মহিষী কিন্তু সুখরে তার মালিনীর নবধর্মকে।

> "...এ তোর কেমন বেশ,
> এ ধর্ম কোথায় পেলি, কী শাস্ত্রবচন?
> আমার শিবের ধর্ম সে তো পুরাতন
> অনাদি কালের। কিন্তু মা গো এ যে নব
> সৃষ্টিছাড়া কোথাকার ধর্ম অভিনব
> অভিশাপ-ভরা। কোথা হতে ঘরে আসে
> বিদেশী সন্ন্যাসী, তোরে আমি মরি ত্রাসে।"

এই উৎকণ্ঠা মায়ের একান্ত। সেই উদ্বেগের কারণেই মাতৃহৃদয় নবধর্মের বিরোধীতা করেন। রাজাকে বলেন :

> "...অবধানপনা আজো থেকে
> মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
> বেলা থেকে যোগ্য হাতে দিক সমর্পিয়া
> দূর হবে নবধর্ম, ঘুচিবে জ্বালা।"

রাজমহিষী শুধু একটা আত্মস্থতেই কঠিন। যেখানে তীব্র ক্ষোভের সম্মুখে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণের যোদ্ধার, তারা মালিনীর নির্বাসন কামনা করে, সেখানেই মহিষীর উৎকণ্ঠিত ঘটি। তারপর অন্তরে যে বহ্নিশিখা ছিল, তার প্রকাশ ঘটল।

"...নির্বাসন। এই যদি হয়
ধর্ম প্রাচারের, তবে হোক, হা, উদয়
মায়ধর্ম—শিখে নিক যেটি আজ হতে
নিত্যধন।

শহীদ নিত্যধন ধর্ম পালনে কোনো শিথিলতা, আপত্তি, দোদুল্যতা, দ্বন্দ্বমুখর থাকতে দেয়। তাই রাজাদের আপত্তি ও অসম্মতি উপেক্ষা করেই তিনি। স্বামীর নিত্যধর্মে বাধা দিতে মহিনীরা পর্যন্তকে প্রস্তুতিপর হয়ে নিয়োজিত তিনি—

কী শিক্ষা শিখাতে এসে আজ
পাপ রাজপুরীতে। পুজারে অধিকে আজ,
ধর্ম নিতে চাও। সে তোমা আমার নয়।

তবে রাজাদুলেন মহিনীরা যারা মন্ত্রমুগ্ধ হলেন ঘটনাকে তিনি সমর্থন করেননি আদৌ। আসলে এ মহিনী পুতুলরা সংসারধর্মে আসীন হলেও শিক্ষা নিতেই আসেনি, দৃঢ়তর বর্ণনালাদের অস্তীকার তাঁর মধ্যে নেই।

তবে রাজা রাজাদেরকে প্রভাবে নিশ্চয়ই। মহিন রাজধর্ম আর শিক্ষাদের এই দুয়ের বিশ্লেষণেতে তিনি যে শিক্ষার আর আসলে তোলে নিতে তিনি নিশ্চয়ই। সমস্যাটি প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ বা মনোভাব প্রকাশের প্রতি অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের কোনোটিই আর নেই। আসলে নিত্যধর্ম চেতনাতার জন্য রাজা মহিনীকে শুধু একটি সোপানে একটু ঘিরিয়ে হয়ে থাকতে বলেন—

"...বর্ষাইতে রাখিতে চাও
তাহা মনে মনে।"

মহিনীর রাজা দুরত্বাজক হয় মহিনীর নির্বাসন। সেখানেও রাজা সোজাসুজি। দুরত্বাজকে বলেন :

"নিয় আজে নির্বাসন, পুরাণ রাজধর্ম,
সহিনি কর্তব্য তোর। যদি অধিকার না
দৃঢ় আমি মোরমুখ, অন্তর দুর্বল,
রাজধর্ম দুরুহ তাই তেমি আজুজন।"

অবশ্য কর্তব্যসম্পাদনে অটিলক হয়ে দাড়ায় না তিনি। 'নিত্যধর্ম' সহিনক শিক্ষা হলেও রাজুপতি হেসাবে রাজনিতিক প্রয়োজনিতে অন্য নীতিনিয়মের অনুসরী হতে, শিখা নিয়েছে মহিনীর শিখা আবেগ সহিষ্ণু, আবেগ দুর্বল। সমাজমনস্কের প্রতি অনুরাগ এই ভিন্নধর্মী কাশীরাজ পুত্রটি প্রশংসক হিসেবে বন্ধ। যে ধর্ম যা রাজনীতিকে তিনি নিজের নিত্যধর্ম পালনে অটিলে, সেটি রাজ্যপুরীর মঙ্গল কল্পে সম্পূর্ণে অন্তরালে নিয়েছে, তখন আজুত শাসক তিনি, গভীর শিখা।

৩.৭ ❑ নাট্যপ্রকরণ : 'মালিনী'

এ নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে নাট্যগঠন সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটা দিকের সূচনা ঘটে।

১। "সেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ"

২। "একদিন [illegible] মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনেছি। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন—এই নাটকে তিনি গ্রীক নাটকের প্রতিরূপ দেখেছেন।"

৩। "মালিনীর পরিণাম সংহত, সংযত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।"

এ নাটকে রয়েছে অঙ্কবিহীন চারটি দৃশ্য। অবশ্য অঙ্কযোজনা করে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে ভারাক্রান্ত করেননি। পণ্ডিত প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"ইহাকে দুই অঙ্কে ভাগ করিলেই নাটকীয় ঐক্যটিকে অধিক রক্ষা করা হইত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দৃশ্য—প্রথম অঙ্ক এবং চতুর্থ দৃশ্যটিকে দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত করা উচিত ছিল। তৃতীয় দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান আছে, তাহা ছাড়া চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান দুইটি চরিত্র, মালিনীর ও সুপ্রিয়ের চরিত্রে অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অতএব ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্যও অঙ্কপাতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নাটকের এই আর্টের আঙ্গিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিরকালই মনোযোগের অভাব" (রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা ৬৬); তবু আমরা খুঁজবো, ঠিক কোন নাট্য গঠনে গ্রথিত এই 'মালিনী'।

১। শেক্সপীয়রীয় গঠন অনুযায়ী এ নাটকে এটি অঙ্ক বা পাঁচ দৃশ্য নেই, এটি দৃশ্যের শ্রেণী। তবে সাধারণ নাটকের পঞ্চসন্ধি অনুযায়ী কাহিনীবিন্যাসে Exposition (আরম্ভ), rising action (আরোহণ), climax (শীর্ষবিন্দু) falling action (অবরোহণ) ও Catastrophe (শেষ সমাপন) রয়েছে। শুধু [illegible] মালিনীর ধর্মার্থ [illegible], প্রজা ও ব্রাহ্মণদের [illegible] মালিনীকে নিয়ে উদ্বেগের আয়োজন, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মালিনীকে নিয়ে সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরের কথোপকথনের সন্নিবেশ, মালিনীর প্রতি ব্রাহ্মণদের আনুগত্যশীলতা এবং সুপ্রিয়-মালিনীর প্রেমে পরিণামের আয়োজন, আর ক্ষেমংকরের আঘাতে সুপ্রিয়ের মৃত্যু ও মালিনীর ক্ষমাপ্রার্থনায় এ নাটকের শেষ সমাপন। নাট্যকাহিনীর পরিবিন্যাসে শেক্সপীয়রীয় পঞ্চসন্ধি [illegible] একেবারেই বিস্মৃত হয়নি।

২। এবার দেখা যাক গ্রীক নাট্যরীতির প্রভাব কতটা। গ্রীক নাটক মানে ত্রিবিধ ঐক্য—time, place, action। নাটকের প্রথম তিনটি দৃশ্যের সময়ের ধারাবাহিকতা থাকলেও চতুর্থ দৃশ্যটি খানিকটা দেশ কালের ব্যবধান রয়েছে। কারণ সুপ্রিয় মালিনীর অনুরাগের পরিণত সময় লেগেছে আর যদি সে রাজার কাছে ছিল তবু ক্ষেমংকরের উদ্দেশ্য সাধনের ও বাইরেকার সাহায্যের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়েছে। রাজার দূতের অভিযানে গিয়ে ক্ষেমংকরকে বন্দী করে নিয়েছেন। তৃতীয় দৃশ্যটির পরে চতুর্থ দৃশ্যটির পরিমাণ মাসখানেক কালের ব্যবধান আছে বা গ্রীক সময়ের

ঐক্যকে দেখেছেন। সমালোচক ঐক্য নাটকে রক্ষিত হয়েছে মনে করা যায় কেননা প্রাসাদ অন্তঃপুর, রাজ-প্রাঙ্গণ ও রাজ-উদ্যান স্বাভাবিকভাবে দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও রাজপ্রাসাদের বা রাজধানীর ই অধীন। এবার ক্রিয়াঐক্যের কথা। ঘটনাবস্তু গতিরিক্তি ও সংহতি ক্লাসিক নীতির এবং গ্রীক নাটকের মূলমন্ত্রকে স্মরণ করায় যোগেছে।

৩। গ্রীক ও শেক্সপীরীয়—এই উভয় নাট্যাদর্শের আনুপাতিক প্রভাবেই 'মালিনী' রূপায়িত। মালিনী অঙ্কের মধ্যে দৃশ্য বিভাগ রবীন্দ্রনাথের এক অনবিচার রীতিতেই এ নাটকে ঘটেছে। দৃশ্যগুলি অঙ্কেরই সমান্তর। তবে এ নাটক একাঙ্ক নয় কারণ নাটকের ঘটনার ও আবর্তন পাঁচটি, সেই অঙ্কের একতায়। দীর্ঘ আত্মকথায় এ নাটক গ্রীক নাট্যাদর্শের সংযোজন, আবার ক্রিয়াশীল চরিত্রের প্রাধান্যে এ নাটক শেক্সপীরীয় নাট্যাদর্শের অনুসারী। 'সংহত' ও 'সংযত' দীপ্তিতে ভারতীয় ক্লাসিক নাট্যদর্শেও 'মালিনী' অনন্য।

৩.৮ ❑ কাব্যনাট্য হিসেবে 'মালিনী'

নাটকের মধ্যে কাব্য যদি আধিপত্য বা কাব্যের নাট্যগুণান্বিত যে সাহিত্য, তাই কাব্যনাট্য। কাব্যনাট্যে কাহিনির বাহনরূপে যা নাটকই আনুগত্য স্বীকার করে। তার সৌন্দর্য রক্ষণে সহযোগিতা করে কোথাও কাব্য। তার তাই কাব্যনাট্যের উদ্দেশ্য হল নাটক এবং তার বিধায় হল কাব্য।

বাংলা সাহিত্যে গিরিশ প্রথম অমিত্রাক্ষর ছিল কবিতার মধ্যে নাটকের আবহাওয়া এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যনাট্যের পথিকৃৎ। ইংরেজীয় সাহিত্যে টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) কাব্যনাট্যের প্রবক্তা ও রূপকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নাটকেই কাব্যনাট্য লিখেছেন। তবে অনুবাদের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যরূপের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক রচিত। কাব্যনাট্য যে গদ্যাত্মক বাস্তব নাটক অপেক্ষা জীবনের মূল সুরটিকে অনেক বেশি ধরিয়ে দেয় তা সম্পর্কে এলিয়ট ছিলেন সচেতন। এলিয়ট-এ—'The tendency, at any rate, of prose drama is to emphasize the ephemeral and superficial, if we want to get at the permanent and eternal we tend to express inverse" ('A Dialogue on Dramatic Poetry')।

কাব্যনাট্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাই সহজেই দেখানো যায়—

১। এর আকার কবিতার, কিন্তু আত্মায় তা নাটক।

২। সংলাপ বাক্যগুলি কবিতার আবেগ উচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত হবে, কিন্তু কখনোই তা নাটকীয়তাকে অতিক্রম করবে না।

৩। চরিত্রগুলির মনের বিপরীতমুখী ভাবের সম্পর্কে দ্বন্দ্বটিকে কবিতার বিচিত্র-বিন্যাস প্রতিফলিত হবে।

৪। কাহিনী অর্ধস্ফুটের মত যুক্ত হবে না। ঘটনার সমাবেশ, দৃশ্য অবতারণা ও পরিবর্তিত রূপ নাট্যকারের নিয়ন্ত্রিত থাকবে না।

৫। এর দ্বারা সৌন্দর্যবিধান করবে, কাহিনী স্থির হবে, এমনকি নাটকের মুহূর্ত দৃষ্টিতেও সক্ষম হবে।

এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য—"যে কোনো মুহূর্তে ভাবনা বা অনুভব অনুভূত পাঠকের তাকলাম করতে পারে এমন ভাবরূপায়ণ যদি নির্মাণ করতে হবে ভাষারীতি, তার জন্য নিরবিচ্ছিন্নতার মধ্য এক ছন্দের প্রয়োজন এবং এর দ্বারা একদিকে যেমন নাটকে রীতিবৈচিত্র্যের সাবলীলতা ও কাব্যিকতার চিত্রময়তা যুক্ত হবে, অন্যদিকে তেমনি কবিতার রূপগুণ প্রকাশিত হবে বহুগুণে।" (সাহিত্যকোষ : নাটক)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটক গুলি—'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'মালিনী' (১৮৯৬)। প্রতিটি কাব্যনাটকেই রবীন্দ্রনাথের কবির মনের স্পর্শ দিয়েছে। ভাবাবেগের গীতিময় রূপকে কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করে প্রতিটি নাটকই চরিত্রের দ্বন্দ্বমূলক ভেতরে কবির মনকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'মালিনী' নাটকে প্রতিটি চরিত্রের সংলাপে কাব্যের রূপ রয়েছে। নাটকের ক্রিয়াশীলতা, ঘটনার আকর্ষণ, নাটকীয় উৎকণ্ঠা—সবকিছুর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাট্যগুণের সঙ্গে কাব্যগুণ সমন্বয়ের সাধনা করে চলেছেন। আধুনিককালের অনেক কবিতা ও নাটকের আনুষ্ঠানিক ভেদরেখার যেমন খুঁজে পাচ্ছেনা। তাই কাব্যনাটকে কবিতার প্রাধান্য আর প্রয়োজনীয় নয়। সংলাপগুলো যে দুরূহ কাব্যিক হবেই নাট্যগুণ নির্মাণের সহায়ক হতে পারে। সেক্ষেত্রে যেমন নাটক ও কাব্যনাটক আলাদা থাকছে। কাব্যের বৈশিষ্ট্য যদি তার ছন্দ-সাজিত বিন্যাস, অলঙ্কার, রূপ, আবেগ, ভাবের ঐক্য হয়, আর নাটকের বৈশিষ্ট্য যদি তার সংলাপ, দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা হয় তবে এদের অন্যান্যের বৈচিত্র্যের ও সমন্বয়ের ফলে সার্থক কাব্যনাটক হয়ে ওঠে এ যোগের নাটক। 'মালিনী' সেরকমই রূপগুণ থেকে ও অন্তর্নিহিত কাব্যধর্মে। সমস্ত ভাবনাতেই তাই এর সার্থকতা।

৩.৯ □ গ্রীকনাটক ও 'মালিনী'

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীস ও ভারতবর্ষ—এই দুই দেশেই নাট্যসাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার Aeschylus (খ্রীস্টপূর্ব ৫২৫-৪৫৬) এর 'Persians' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ৪৭২ অব্দে। আর অপর দুই প্রধান গ্রীক নাট্যকার Sophocles (খ্রীস্টপূর্ব ৪৯৫-৪০৬) এবং Euripides (খ্রীস্টপূর্ব ৪৮০-৪০৬) ও পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। গ্রীকের নাটক সম্বন্ধে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক Aristotle (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে আলোচনা করে গেছেন। সুতরাং সেই আলোচনা সম্বন্ধে নিয়েই গ্রীকনাটক সম্পর্কে আলোচনাটি জানা হয়ে যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন—"...একদিন ট্রেভেলিয়ানের যুগে এর সম্বন্ধে ভাবনা পুনশ্চ। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন—এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তার অর্থ কী তাহা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, কারণ গ্রীক কিছু কিছু পড়েছি শুধু গ্রীকদেরই আমার অভিজ্ঞতার

করিয়ে।" তবু, আমরা গ্রীক নাটকের সঙ্গে 'মালিনী' নাটকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অর্থাৎ সামগ্রিক তুলনা বোঝার একটি চেষ্টা করি।

১। "Aeschylus, like all great tragic poets, was not the obedient servant but the imperious master of his sources' (Greek Tragedy : H. D. F. Kitto : P-103)। তাই গ্রীক পুরাণ থেকে কাহিনি নিয়ে যেমন গ্রীক নাটক রচিত হতো, তেমনই রবীন্দ্রনাথও বৌদ্ধকাহিনি 'মহাবস্তু-অবদান' থেকে 'মালিনী'-র কাহিনি গ্রহণ করেছেন।

২। গ্রীক নাটকে অতীতের কাহিনিকে পরিবর্তন করে যেমনভাবে সমকালীন করে দেখানো হতো, তেমনই এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেখা সময়কে যুক্ত করে কাহিনির নতুন রূপ দিয়েছেন।

৩। গ্রীক নাটক একটি দৈবিক নীতি দিয়ে আবৃত থাকত। যিনি অন্যায় করবেন তাঁর পরিত্রাণ নেই। এ নাটকের ধর্মনৈতিক পরিবেশে অন্যায় হলেই তিনি অভিশাপের দায় পড়বে অন্যায়কারীর ওপর।

৪। গ্রীক নাটকে মধ্যভাগে Miracles বা দৈব ঘটনা ঘটানো হয়। 'মালিনী' নাটকে ব্রাহ্মণেরা যখন দেবীকে আহ্বান করলেন তখন মালিনীর মূর্তিতে রবীন্দ্রনাথ মালিনীকে হাজির করিয়েছেন। এ যেন শিল্পকলা কৌশলে অলৌকিকত্বকে লৌকিকে আনলেন।

৫। Sophocles অভিনয়যোগ্যতাকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও কাব্যের অভিনীতিকে ব্যর্থ হতে দেননি।

৬। গ্রীক নাটকগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত, 'মালিনী'-তেও তেমন সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুতগতি দেখা যায়। উভয় নাটকেই অবান্তর ঘটনা বা কাহিনির স্থান নেই। তাই উপন্যাসের মতো ক্ষেমংকরের যে পরিবার ও নগর দেখেছিল, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো নতুন দৃশ্য রচনা করেননি।

৭। গ্রীক নাটকের মতো 'মালিনী'-ও 'imitation of action and not imitation of character : চরিত্র বিশ্লেষণের কোনো দায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

৮। স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্যনীতিবদ্ধ গ্রীক নাটকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। 'মালিনী' নাটকের দৃশ্যগুলি রাজার অন্তঃপুর, মন্দির-প্রাঙ্গণ, রাজ-উপবনের মধ্যে স্থাপিত, সুতরাং স্থানের ঐক্য নেই। সময়ের ঐক্যের দিকে নজর দিলে বলতে হয় প্রথম তিনটি দৃশ্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা থাকলেও চতুর্থ দৃশ্য অনেক পরে ঘটেছে। একমাত্র ঘটনার ঐক্যের দিকে এ নাটক গ্রীক ঐতিহ্যের অনুসারী। ঘটনার কোথাও শিথিলতা, অপ্রয়োজনীয়তা নেই। তা নিবিড় ও সংহত।

৯। সবদিক থেকে বিচার করলে 'মালিনী'কে গ্রীক নাটকের একটি অভিনব ও বিয়োগান্তক ভাবাদর্শের উত্তরসূরী বলা চলে।

তবে গ্রীক নাটকের অনবদ্য ও অমূল্য উপলব্ধির লীলা এখানে নেই। প্রতিটির নাট্যদৃশ্যের নিষ্ঠা এখানে লোকোত্তর আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। 'কোরাস'-এর অভিনবত্বও নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলায় 'মালিনী'-র সঙ্গে গ্রীক নাটকের সাদৃশ্য।

৫.১০ ❑ ট্র্যাজেডিবিচার ঃ 'মালিনী'

গ্রীক ও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি—দু রকম। গ্রীক দেশের ট্র্যাজেডির কারণ নিয়তি বা বিধিলিপি। নিয়তিতাড়িত হয়ে নায়ক ট্র্যাজেডির শিকার হতে পারে। আর শেক্সপীয়রের চরিত্ররা কোনো দুর্বলতা বা বুদ্ধিবিভ্রান্তির কারণে ট্র্যাজেডির শিকার হয়। তারা সহজ-সরল বা উচ্চাকাঙ্ক্ষীর প্রতিনিধি হয়েও কোনো দুঃসাহসের কাছে অন্তিমকালে পরিণতির শিকার হয়ে, ফলতে বাধ্য হয়। মোটকথা, নায়কের দুর্বল মনোবৃত্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সংঘাতই হলো ট্র্যাজেডির বিষয়। Aristotle তাঁর 'Poetics'-এ ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল—"...ট্র্যাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ; ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ অলংকৃত, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়; আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্য দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।" (শিশিরকুমার দাস, কাব্যতত্ত্ব আরিস্টটল, প্যাপিরাস, ১৯৮৬, পৃ. ১৫)। তবুও রবীন্দ্রসমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'মালিনী'কে মোহগ্রস্ত ট্র্যাজেডি, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় 'মালিনী'কে 'বিসর্জন' অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি এবং অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী 'মালিনী'-কে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মতো মানবপ্রকৃতিতে অস্বীকৃতির কারণজনিত ট্র্যাজেডি বলেছেন। সুতরাং 'মালিনী' আসলে ট্র্যাজেডি। তবে দেখা যাক কিভাবে এবং কোথায় এই ট্র্যাজিকধর্ম প্রকাশ পেয়েছে।

১। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী'-র সূচনায় স্পষ্টই লিখেছেন—'শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে নাটকের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।" সুতরাং, ধরে নেওয়া যে শেক্সপীয়রীয় রীতির জাল ধীরে ধীরে নাটককে আচ্ছন্ন করেছে 'মালিনী' নাটকে। সুপ্রিয়র মৃত্যু ঘটিয়ে। কিন্তু ট্র্যাজেডি ক্ষেমংকরের ব্যাপারে ঘটেনি। মালিনী যখন ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলেছেন তখন মনে রাখা দরকার হবে না যে শেষপর্যন্ত ক্ষেমংকরের মৃত্যুদণ্ড হয়নি। সুপ্রিয়কে হত্যা করে সেই আত্মার স্মৃতি দিয়ে ক্ষেমংকর কি সুপ্রিয়র জীবনযাপন করেছিলেন সেকথা জানতেও কেমন লাগে। সে কঠিন, অবিচল। তাই তার আপন আসনে না এতটুকু নয়। ভক্তির উপরই সে আসন বেশী বড়ো।

২। অ্যারিস্টটল Peripeteia শব্দটি দিয়েছিলেন ট্র্যাজেডির উপাদান প্রসঙ্গে। একে ভাগ্যবিপর্যয় বা reversal of fortune বলা যায়। যে বিধিলিপি ভাগ্যলিপি, তাকে যখন নিয়তিই বন্দী করি বা নিজে বন্দী হই, তখনই সত্যিকার ট্র্যাজেডি জন্মায়। ক্ষেমংকর তারই নিদর্শন।

৩। নায়কচরিত্রের লক্ষ্য বা আত্মসংস্কৃতি একটা এক জায়গায় যখন পৌঁছায়, তখন দুঃখ-আনন্দ

হ্যামলেটের মতো তাকে লড়াই করতে হয় নিয়তির সঙ্গে, নিজের অন্তরের নিজের সত্তা অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে; আর তখনই ঘটে ট্র্যাজেডি। ক্ষেমংকরের বুদ্ধি, চিন্তা, আবেগানুভূতি তার ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এনেছে।

৪। 'মালিনী'-র পরিসমাপ্তিতে হৃদয়ে মূল্যবোধই বড়ো হয়। সুপ্রিয়র মৃত্যু আমাদের সাবধান করে দেয়। ধর্মবিশ্বাস কোনো অধিকার কোনো ব্যক্তির হাতে নেই। ধর্ম হৃদয়ের জিনিস, যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্ষেমংকরের কোনো দিক মানবধর্ম রক্ষিত হয় না। সুপ্রিয়র মৃত্যুর করুণ পরিণতি দিয়ে তাই-ই তো আমার ট্র্যাজেডি ছাড়া এ আর কি।

৫। 'মালিনী' নাটকের ট্র্যাজেডি বাইরে থেকে আরোপিত নয়। Hamlet এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, Macbeth-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, Othello-র ঈর্ষা যেমন, তেমনই সুপ্রিয়-মালিনী-ক্ষেমংকর প্রত্যেকের আচরণ এবং মনোভাবই ট্র্যাজেডি সৃষ্টির জন্য দায়ী। কোনো একজনের Hamartia বা ত্রুটি এর জন্য দায়ী নয়।

৬। তবু, শেষ পর্যন্ত 'মালিনী' শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে না কারণ রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিতে নায়কের মৃত্যু নেই। সেখানে মৃত্যু তার নিকটতম মানুষকে গ্রাস করে তার জন্যে রেখে দেয় জীবনব্যাপী হাহাকার আর অনুশোচনা।

৩.১১ ❑ সংলাপবিচার : 'মালিনী'

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন—"সংলাপঃ স্যাদ্ গম্ভীরোক্তির্নানাভাবসমাশ্রয়ঃ", অর্থাৎ বিবিধ ভাবের আশ্রয়পূর্ণ গম্ভীর উক্তি হল সংলাপ। চরিত্রের মুখে উচ্চারিত বিভিন্ন ভাবের উক্তি নাট্যসংলাপ। তবে তা গম্ভীর বা অগম্ভীর তা অবশ্যই চরিত্রগুলোর উপর নির্ভরশীল। ভরতের মতে নাট্যপাত্র আর্যভাষা, অতিভাষা, জাতিভাষা, যোন্যন্তরের শ্রেণির ভাষা রয়েছে। নাট্যধর্ম মতে সে নাটক আবার স্বাধীন। অ্যারিস্টটলের মতে নাট্যভাষা অলংকারবহুল, ছন্দোময়। নাট্যভাষা গদ্যময় ও পদ্যময়-ও হয়। 'মালিনী'-র নাট্যসংলাপের গঠন নাটকীয় এবং কাব্যময় উভয়-ই। কবিতার ছন্দে লেখা তাই সংলাপগুলো। আবার নাটক রচনার উদ্দেশ্য থাকলেও কুশীলবদের মুখে কোথাও বা কাব্যরসকেই গ্রহণ করেছে। সেটা রাজনীতির প্রবহমান পয়ারে কথা বলেছে। অমিত্রাক্ষর মুক্তিলাভ হয়েছে। পঞ্চাশটি এ সংলাপ কাহিনির ঐতিহাসিক আবেদন তৈরিতে সাহায্য এনেছে। উৎপ্রেক্ষা, উপমা, সমাসোক্তি অলংকারে, সাধু ক্রিয়াপদে সংস্কৃতানুসারে মধ্যে করায় 'মালিনী' কাব্যময়। বিদ্রোহীর কলহাকুলির এ নাটকে নেই। রাজানুগত ব্রাহ্মণ সমাজের আদর্শ, তারা মূলত শিক্ষিত সম্প্রদায়। আর অবশিষ্ট চরিত্রের প্রত্যেকের অধিকার আত্মস্বার্থ বা শিক্ষিত অভিজাত বাচিক। নারীর আবেগের ভাষা, প্রেমিকের হৃদয়ের ভাষা, সহানুভূতির নিষ্ঠুরতার ভাষা, রাজার রাজকীয় ভাষা—সব মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে 'মালিনী'-র সফল নাট্যভাষা ও নাট্যসংলাপ।

৩.১৫ ❑ বিষয়বস্তু : 'মালিনী'

দ্বন্দ্বই তো নাটকের প্রাণ। 'All drama arises out of conflict. In tragedy there is ever a clash between forces physical or mental or both; in comedy there is ever a conflict, between personalities, between the sexes or between an individual and society.' ([illegible], ১৩৯১, পৃষ্ঠা ৮)। এ দ্বন্দ্ব [illegible] যে কোনো স্তরেই হতে পারে। এ নাটকে [illegible] 'মালিনী'-র [illegible]

[illegible]

ধর্মকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা যে ক্ষেমঙ্করের তার এটুকু বিশ্বাস নেই যে ধর্ম তার অন্তরাত্মার শক্তির জোরেই টিকিয়ে থাকে, তা জোর করে চাপানো যায় না। তাই সে শাস্ত্র থেকে শাস্ত্রে নির্ভরশীল হয়েছে। সুপ্রিয়র আত্মবিসর্জন তাই সহজেই অবদান করেছে মালিনীর কাছে। তাৎপর্য এটাই যে মালিনী কখনোই সমর্থ ও ক্ষেমঙ্করের হাতে আত্মবিক্রিতা নয়। নিষ্পাপের শুদ্ধ ও সংবেদনশীল বলেই, অন্তঃপূর্ণ ধর্মে আস্থাশীল বলেই মালিনী ক্ষমাধর্মে অভিষিক্ত হয়েছে। আসলে এ নাটক ধর্মবোধের পরিস্থিতির মানবীয় জীবনে আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও। মানুষের ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন "মানুষের একটা দিকে বন্ধন, অন্য দিকে মুক্তি"।

৩.১৩ ❑ নাট্যপ্রযোজনা : 'মালিনী'

রবীন্দ্রনাটক খুব একটা মঞ্চসফল নয় বা হয়না—ইতিহাস এ কথা বললেও বাংলা রঙ্গমঞ্চ জানে রবীন্দ্রনাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে 'বহুরূপী' নাট্যদল (১৯৪৮) এর ভূমিকার কথা। রবীন্দ্রনাথ এর 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক বহুরূপী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়ন করেছে। 'মালিনী'-র ১ম অভিনয় হয় ১৯৮৬ সালের ১লা মে Academy of fine arts হলে। 'বহুরূপী' নাট্যদলের ৩৮তম বর্ষপূর্তি ও রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'মালিনী' মঞ্চায়ন।

সেদিনের সেই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহুজনই। তার তালিকা :

❑ 'মালিনী' ❑

নাটক : রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদনা ও নির্দেশনা : কুমার রায়

মঞ্চ : সুদেব দত্ত

আলো : নির্মল ঘোষ

আবহ : অমী সেন

রূপসজ্জা : শক্তি সেন

❑ অভিনয়লিপি ❑

কাশ্যপ : কুমার রায়

মালিনী : দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্ঞী : দেবিকা মজুমদার

আলোক : দেবেশ রায়চৌধুরী

সুচিত্র : গৌতম বসু

প্রচার : সমর রায়চৌধুরী

অভিনয় : আবুল খায়র, সমীর মুখার্জী, সুশান্ত দাস, শান্তনুমার ঘোষ, সুব্রত সেন, প্রণব মিত্র, লক্ষ্মীকান্ত সাহা, অমিতাভ মাইতি, সুশান্ত মুখার্জী, সুব্রত গুহ রায়, অমিত হালদার, সঞ্জয় ব্যানার্জী, সমীর রক্ষিত, সুজিত মুখার্জী।

নৃত্যাংশে : শঙ্খ ঘোষ, মালবিকা মজুমদার, মধুমিতা রাণী সরকার।

❑ বহুরূপী কেন 'মালিনী' নির্বাচন করল নাট্যনির্দেশকের জন্য তার বক্তব্য—

বারে বারে এক অদ্ভুত পরম্পরা শোনা যায় এই ভারতভূমিতে। আজও আমাদের এই ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িকতার মতো আদ্যন্তরিক এক সোনালি শিকার দেখতে পাচ্ছি আমরা। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হচ্ছে মানুষ। যেন মধ্যযুগের অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকে সেই অন্ধকার দূর করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধর্ম প্রাচীন নয়, ধর্ম আলো—প্রেম প্রীত। আলোকের আলোতে সত্যের জোর দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এক বাঁধা কথা। 'মালিনী' নাটকে নাট্যকারকে দাঁড়াতে হবে যখন দেখতে পাওয়া যায় ক্ষেমংকরের মতো এক ভয়ংকর 'না' বলে আছে। বৌদ্ধধর্মে সে নবধর্মে দীক্ষিত হতে দেবে না, মিথিলা রাজ্যকে, শিক্ষার্থীকে, বিশ্বাসের আলোকোজ্জ্বলকে, মুক্ত-মন তার প্রতিবাদ অন্ধকারকে প্রবেশ করতে দেবে না। আর কাশীরাজকন্যা মালিনী। তার মধ্যে নতুন ধর্মের বোধ বিকশিত হয়ে মানবলোকে স্নিগ্ধ প্রকাশরূপে, মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। ক্ষেমংকরের এই আচার-প্রথা ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিয় সেই মুক্ত মনেরই আলো জ্বালতে চেয়েছে। নিজেকে বহুদূর অর্থের হাতছানি এড়িয়ে, যেখানে মানব, যেখানে মানবের বোধ—যেখানে পরস্পরের ভালোবাসা দৃঢ় বন্ধন হয়ে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছে। একদিকে মালিনীর আদর্শ আর অন্যদিকে বন্ধু ক্ষেমংকরের প্রতি সুপ্রিয়র আত্মমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, একটা টানাপোড়েন, দোলাচল তৈরি করে নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটিয়েছে। বহুরূপী এ নাটক নির্বাচন করেছে যেমনি এ কাহিনী আজকের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অর্থে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই বার্তাটিকে অবশ্যম্ভাবী চিনিয়ে দিতে পারলে আমাদের কাজ সার্থক হবে। চিরকালীন নয়, চিরকালীন এ নাটক।

❑ কেন প্রযোজনা 'মালিনী' নাটক তার উত্তরে কুমার রায়ের বক্তব্য

"ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে যেখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, সেখানে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছে বহু মানুষ যুগে যুগে, আবার মনে হয়, আজও এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে সেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রতিনিয়ত আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। এই আবহমানের বিরুদ্ধে মালিনী সময়োপযোগী প্রতিবাদ।"

❑ প্রশ্নাবলী

❑ বিস্তৃত প্রশ্ন

১। রবীন্দ্র নাট্যধারায় 'মালিনী'র অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। মালিনী চরিত্রটি এই নাটকের প্রাণ—আলোচনা করুন।

৩। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় চরিত্রদুটির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪। "ক্ষমো ক্ষেমংকরে"—মালিনীর এই উক্তির প্রেক্ষিতে সুপ্রিয়-ক্ষেমংকর-মালিনী চরিত্রের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করুন।

৫। 'মালিনী' নাটকের গঠনকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন। তা গ্রীক না শেক্সপীয়রীয়—কোন পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছে?

৬। 'মালিনী' নাটকের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৭। কাব্যনাট্য কাকে বলে? কাব্যনাট্য হিসেবে 'মালিনী' নাটকের গুরুত্ব কতখানি তা বিবেচনা করুন।

৮। গ্রীক নাটকের সঙ্গে 'মালিনী' নাটকের কোথায় সাদৃশ্য আছে তা আলোচনা করুন।

৯। ট্র্যাজেডি কী? 'মালিনী' নাটকের ট্র্যাজেডি কি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে?

১০। 'মালিনী' নাটকের মর্মবস্তু আলোচনা করুন।

❑ অবিস্তৃত প্রশ্ন

১। বিশেষ কোনও ধর্মের আচার বলা নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়, ধর্মীয় কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধেই নাট্যকার লেখনী—আলোচনা করুন।

২। খুব সহজেই মালিনী জয় করে নিয়েছে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের—বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করুন।

৩। 'অন্যায়ের মূল উৎপাটন করে কি কি করছেন'?—এই উক্তি দিয়ে ক্ষেমংকরকে কতটা চেনা যায়?

৪। রাজনন্দিনী মেয়েটি সেবাধর্মের এবং আর্যধর্মের একজন মা—কর্তব্যবোধ দিয়ে তাঁর ভালোবাসা তৈরী—আলোচনা করুন।

৫। রাজকর্মচারী আর বিদ্রোহী, এই দুটোর মধ্যে বিবাদী কারা হয়েছেন—আলোচনা করুন।

৬। নাট্যভাষা ও নাট্যসংলাপ 'মালিনী'র সফল দিক আলোচনা করুন।

৭। মধুসূদনী নাটিকা কেন 'মালিনী' প্রযোজনা করেছিল?

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'মালিনী' নাটকটির রচনাকাল কত?

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কততম নাটক এটি?

৩। মালিনী কোন্ ধর্মের পূজারিণী?

৪। মালিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কারা ছিলেন?

৫। মালিনীর কোন্ শক্তি ব্রাহ্মণরা কামনা করেছিলেন?

৬। "তুমি শুধু বিশ্বমাতা"—কে, কখন বলেছিলেন?

৭। মালিনীকে "লোকললামভূতা" বলার তাৎপর্য কী? "সত্যধর্ম বর্তমান কর্মকাণ্ডের অনুসার তত্ত্বনিষ্ঠ নয়" কাকে কাকে বলা হয়েছে? কেন?

৮। "সবার বাহির আমি তোমার চরণে বন্দনের মতো"—তাৎপর্য কী?

৯। ক্ষেমংকর কার কাছে "ধর্মের পরীক্ষা" দেবার প্রস্তাব করেছিলেন?

১০। "ইন্দ্রজাল মেঘ তুমি তাহ" কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?

১১। "গৌতমবিজয়" কথাটি কবি কোথায় ব্যবহার করেছেন?

১২। 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' বইটি কে, কবে লেখেন?

১৩। পঞ্চাঙ্ক কাব্যনাট্যের লক্ষণ লেখ।

১৪। বাংলা কাব্যনাট্যের পরিচয় দাও।

১৫। রবীন্দ্রনাথ মোট কটি কাব্যনাটক লিখেছেন? কি কি?

১৬। Peripeteia কী?

১৭। Hamartia কী?

১৮। বহুমুখী করে 'মালিনী' আলোচনা করো।

❑ পাঠসহায়ক গ্রন্থ

- ❑ রবীন্দ্রনাট্যপরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
- ❑ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী,
- ❑ রবীন্দ্রনাট্যপরিচয়—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড
- ❑ রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি—সোমেন্দ্রনাথ বসু, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
- ❑ বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিন্টার্স
- ❑ রবীন্দ্রনাথের মালিনী—অসিত ভট্টাচার্য, ইস্টার্ন বুক এজেন্সি